শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দারোগার দপ্তর

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

অরুণ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

'দারোগার দপ্তর' প্রসঙ্গে

'দারোগার দপ্তর' নামটি শুনলেই চলে আসে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৪, পৃ. ৩১৭) জানাচ্ছে, ''প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন। নদিয়ার জয়রামপুরের চুয়াডাঙায়। তাঁকে বলা হয়েছে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের পথিকৃৎ। পেশায় ছিলেন পুলিশ কর্মচারী। তিনি 'দারোগার দপ্তর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে ১২ বছর চালিয়েছিলেন। এ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি পরে 'ডিটেকটিভ গল্প' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হয়। রচিত গ্রন্থ ঃ 'তান্তিয়া ভিল', 'ডিটেকটিভ পুলিশ' (৬ খণ্ড), 'ঠগিকাহিনী', 'বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি।'' উৎস নির্দেশ থেকে জানা যাচ্ছে, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধানের প্রধান সম্পাদক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও সম্পাদক অঞ্জলি বসু শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত 'জীবনীকোষ'-কে গ্রহণ করেছেন। কর্মজীবনের সাফল্যহেতু ইংরেজ সরকার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। জানা যাচ্ছে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ২০জুন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে।

শিশিরকুমার দাস সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী'। এই গ্রন্থের (ফেব্রুয়ারি ২০০৩, প্রথম সংস্করণে) ৯৬ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে —

দারোগার দপ্তর (১৮৯২) ঃ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এই ডিটেকটিভ গল্পের ধারা শুরু করেন। অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রিয়নাথ নিজে ছিলেন পুলিশ দপ্তরের কর্মচারী। প্রধানত নিজের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে এই গল্পগুলি লিখিত হয়। তবে কোনো কোনো খণ্ডে বিদেশি ডিটেকটিভ গল্পের অনুবাদও সংকলিত হয়। এর ১৩, ১৪ ও ১৫ সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' (১৩০০ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়) লিখেছিলেন, ''ব্যাপারটি আমাদের দেশের পক্ষে নূতন।'' এই গ্রন্থধারাকে বাংলা ডিটেকটিভ গল্পের আদি বলা চলে।

সুকুমার সেন 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' (ডিসেম্বর ১৯৮৮, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৫১)-তে লিখেছেন—

''বাস্তব ও অবাস্তব ডিটেকটিভ কাহিনীর সূত্রপাত রীতিমতো করেছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯৪৭)। ইনি কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে কাজ করেছিলেন তেত্রিশ বছর ধরে। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে তারিখে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, প্রিয়নাথ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে চাকরিতে যোগদান করেন। আত্মজীবনীর উপক্রমণিকায় (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রিয়নাথ লিখেছেন, ''দীর্ঘকাল ডিটেকটিভ পুলিশের কার্য করিয়া যে সকল মকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় দারোগার দপ্তরে প্রকাশ করিয়া থাকি।''

দারোগার দপ্তর মাসে মাসে বেরোত। প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায়ই একটি কাহিনি থাকত। সুকুমার সেন বলছেন, দারোগার দপ্তরের প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৩০০ সালে অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। অনেকেই তা কিনতেন। কি শহরে কি গাঁয়ে সর্বত্র শিক্ষিত ভদ্র বাঙালির ঘরে এই দু চার সংখ্যা দেখা যেত। ড. সেনের মতে, দারোগার দপ্তর পুলিশি কাহিনির এবং সেই স্বাদের রোমাঞ্চকর ক্রাইম সত্য কাহিনির মালা।

মূল দারোগার দপ্তরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে দারোগার দপ্তরের সূচনা। বৈশাখ থেকে চৈত্র বাংলা বছর অনুযায়ী বারোটি সংখ্যায় বারোটি গল্প থাকত। প্রথম বর্ষের বারোটি সংখ্যায় ছিল ঃ বৈশাখে 'বনমালী দাসের হত্যা', জ্যৈষ্ঠে 'যমালয়ের ফেরতা মানুষ', আষাঢ়ে 'জুয়াচোরের বাহাদুরি', শ্রাবণে 'জালিয়াৎ যদু', ভাদ্রে 'জুয়াচোরের তীর্থযাত্রা', আশ্বিনে 'অদ্ভুত হত্যা', কার্তিকে 'চোরের গাড়ি চড়া', অগ্রহায়ণে 'চোরে চতুরে', পৌষে 'চোরের চক্ষুদান', মাঘে 'চোরের উপর বাটপাড়ি', ফাল্গুনে 'জুয়াচোরের শিবপূজা', চৈত্রে 'কৃত্রিম মুদ্রা'। দ্বিতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হল 'আসমানী লাস'। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শিরোনামে লেখা আছে 'আসমানী লাস' এবং তারপর প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'ভয়ানক লোমহর্ষণকর

novel reading public will appreciate his efforts to entertain them. The book can be obtained of Babu Baneenath Nandee, at 12 Sikderbagan Street, Calcutta for 2 *annas*."

পরপর তিনটি লাইন জুড়ে বিজ্ঞাপন। বেশ বড়ো বড়ো হরফে। বিজ্ঞাপনের দিকে একটু চোখ দেওয়া যাক।

অভাবনীয় ঘটনা!
যাহা কখন ঘটে নাই, যাহা সহজে হইবে না,
আজ তাহাই হইতে চলিল।

২৪ সংখ্যক দারোগার দপ্তরের ক্রোড়পত্র হিসেবে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে। এছাড়াও রয়েছে উপহারের ডালি। মহাসমারোহে বিপুল আয়োজনের সহিত সন ১৩০১ সালের বৈশাখ হইতে দারোগার দপ্তরের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইতেছে। দারোগার দপ্তর, ডিটেকটিভ পুলিশের প্রসিদ্ধ কর্মচারী এবং সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত হইয়া সকলের ঘরে ঘরে যেরূপ সমাদরে বিরাজ করিতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। দারোগার দপ্তরের মূল্য মায় ডাকমাশুল বার্ষিক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র। আজ তাহার উপর আবার প্রায় দুই টাকা মূল্যের সারবান মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় তিনটি উপহার সেই দেড় টাকা মূল্যেই প্রদত্ত হইবে। উপহারগুলি হল —

১। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ঠগীকাহিনী' গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখক ঠগী দল সর্দার মহম্মদ আলির জীবনচরিত লিখেছেন। যে একে একে ৭১৯টি নরহত্যায় লিপ্ত ছিল। ইহার জীবনচরিত কি ভয়ানক ও কিরূপ বিভীষিকায় পরিপূর্ণ তা জানা যাবে 'ঠগীকাহিনী' পড়লে।

২। প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ মহানুভব শংকরাচার্যের সুমিষ্ট লেখনী প্রসূত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্তব, মূল এবং বাঙ্গালা অনুবাদসহ পরিপাটিরূপে মুদ্রিত 'পঞ্চস্তোত্র' গ্রন্থ।

৩। সন ১৩০১ সালের একখানি পঞ্জিকা।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, তখন দারোগার দপ্তরের প্রচারের জন্য উপহারস্বরূপ বই দেওয়ার রীতি চালু ছিল।

দারোগার দপ্তর সম্পর্কে শ্রীদামোদর দেবশর্মার বক্তব্য উপস্থাপিত করার লোভ সামলাতে পারছি না। দামোদর দেবশর্মা অর্থাৎ দামোদর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Detective Story-গুলি বঙ্গভাষায় মৌলিক Sensational Novel রূপে পরিগণিত হইবার উপযোগী।" দারোগার দপ্তর দামোদরবাবুর কাছে যেরূপে প্রতিভাত তা বলতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি বলছেন, "প্রিয়বাবুর পুস্তকগুলির অধিকাংশেই তিনি স্বয়ং প্রধান অভিনেতা প্রায় সর্বত্র তিনি অন্ধকার কোটর-মধ্যস্থ পাপীকে নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত, উদ্যতভাবে দণ্ডায়মান। তিনি সুযোগ্য ও অসীম প্রতিভাসম্পন্ন রাজকর্মচারী। তাঁহার পুস্তকোক্ত অধিকাংশ পাপীকে, তিনি স্বয়ং হাতে-কলমে টানিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ সত্যের সম্মিলনে তাঁহার গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলী সজীবভাবে পাঠকের নয়নসম্মুখে সমুপস্থিত হয়। প্রিয়বাবুর ভাষাও বড় সরল। অনুপ্রাসের কাননে প্রবেশ করিয়া শব্দপ্রসূন-চয়নে তিনি প্রয়াসী নহেন। অলঙ্কারের কণ্টকে তাঁহার ভাষাসুন্দরী শোণিত বিলেপিত কায়া নহেন। এই গ্রন্থগুলিতে সরল কথায়, সরলভাবে, সজীব চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রিয়বাবু আপনার রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আশা করি, সকলেই এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমোদলাভ করিবেন।"

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কেন যে দারোগার দপ্তরকে 'প্রবন্ধ' নামে উল্লেখ করলেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, প্রিয়নাথ নিজের অভিজ্ঞতার কথা ছাড়াও বিদেশি গল্পের অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগিয়েছেন 'দারোগার দপ্তর' রচনাকালে। প্রিয়নাথের বক্তব্য, "দারোগার দপ্তর যখন প্রথম নিয়মিতরূপে মাসে মাসে বাহির করিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে আমার এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না যে, ইহাতে যত প্রবন্ধ বাহির হইবে, তাহার ঘটনা সমস্তই প্রকৃত, বা সমস্তই আমা-কর্তৃক অনুসন্ধিত। এই ভাবিয়া 'Stories' নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু দুই এক সংখ্যা বাহির হইবামাত্রই দেখিলাম, পাঠকগণ 'Stories' এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া, ইহার সমস্তই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকগণও সমস্ত ঘটনাই প্রকৃত বলিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচক অনুসন্ধানকারীর কোনরূপ

অদ্ভুত ঘটনা' লিখে দুটি আশ্চর্য-চিহ্ন দেওয়া। এর আগের সংখ্যায় বৈশাখে প্রকাশ পেয়েছে 'কুলসম'। তাতে কিন্তু বন্ধনীর মধ্যে কিছু লেখা নেই। কোনো একটি গল্প হয়তো এক সংখ্যায় শেষ হয়নি। সেক্ষেত্রে দুই বা তিন মাস ধরে দুই বা তিনটি সংখ্যায় সেগুলি শেষ হয়েছিল। 'ইংরেজ ডাকাত', 'পথে খুন', 'রত্নদন্তিকা', 'খুনী খালাস', 'অদ্ভুত গ্রেপ্তার', 'রাণী না খুনী', 'কৃপণের ধন', 'কুঠিয়াল সাহেব', 'বিষম ভ্রম', 'কুবুদ্ধি', 'ডাক্তারবাবু' ইত্যাদি দুই সংখ্যায় এবং 'লাল পাগড়ি', 'মণিপুরের সেনাপতি', 'রাজাসাহেব' ইত্যাদি তিন সংখ্যা জুড়ে বিধৃত।

প্রথম বছর অর্থাৎ ১২৯৯ বঙ্গাব্দের দারোগার দপ্তর-এর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এভাবে — প্রথম থেকে দ্বাদশ সংখ্যক দারোগার দপ্তরের মূল্য ছিল একত্রে এক টাকা। যাঁরা ত্রয়োদশ সংখ্যা থেকে অগ্রিম মূল্য দিয়ে এক বছরের গ্রাহক হবেন, তাঁদের পক্ষে উপরোক্ত বারো খণ্ডের পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা পড়বে।

দ্বিতীয় বছরের ভূমিকায় দারোগার দপ্তরের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবাণীনাথ নন্দী জানিয়েছেন, "ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ডিটেকটিভের গল্প সম্বন্ধীয় পুস্তকের বহুল প্রচার থাকিলেও তথাকার পাঠকগণের পাঠকলালসা পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহারা আরও পাইবার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠকগণের সেইপ্রকার ঔৎসুক্য জন্মিলেও সেই শ্রেণীর বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক এদেশে পাওয়া যায় না। আমরা এই অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে বর্তমান বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে 'দারোগার দপ্তর' নামে একখানি ডিটেকটিভের মাসিক গল্প-পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"গ্রন্থকার ও প্রকাশক দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি হইলে সেই উভয় কার্যে সুশৃঙ্খলার সম্ভাবনা অধিক বলিয়াই আমরা সেই পন্থা অবলম্বন করিলাম। ডিটেকটিভ পুলিশের বিখ্যাত কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত অনেকগুলি ডিটেকটিভের গল্প আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সেইগুলি ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকরূপে এই মাসিক পুস্তকে প্রকাশিত হইতে চলিল। বিশেষতঃ যাহাতে এই পুস্তকগুলি বাঙ্গালাভাষার বাস্তবিক পরিপুষ্টি সাধন করিতে পারে, আমরা যথোচিত রূপে তাহার চেষ্টা করিব।"

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার থেকে প্রকাশ পেত দারোগার দপ্তর। কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীবাণীনাথ নন্দী। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখের 'কুলসম' গ্রন্থের ভূমিকায় বাণীনাথ নন্দী পাঠকদের উদ্দেশে জানিয়েছেন, "আমরা যে ব্রতে ব্রতী হইলাম, তাহা এদেশে নূতন; সুতরাং ইহাতে অনেক বাধাবিপত্তি আছে। সে সকল সত্ত্বেও আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যপথে অগ্রসর হইলাম। আশা করি তাঁহারা আমাদের কর্তব্য আদ্যোপান্ত আলোচনা ও পুস্তকের গুণাগুণ সমালোচনা করিয়া আমাদের এই নূতন উদ্যমে ভাষার পরিপুষ্টি সাধনে ও সদ্‌গ্রন্থ প্রচার কার্যে সহায় হইবেন ও যাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহাই করিবেন।"

'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকার ১৪ বৈশাখ ১৩০০ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় 'কুলসম' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখা হল — "এই গল্পপাঠে লোকচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ হইবে। অথচ সেই সঙ্গে গল্পপ্রিয় পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবে।"

১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখের 'উলুবেড়িয়া দর্পণ' লিখেছে, "দারোগার দপ্তর ত্রয়োদশ সংখ্যা (কুলসম) ডিটেকটিভ পুলিশের সুপ্রসিদ্ধ কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা। প্রিয়নাথবাবু নিত্য কার্য্যকালে যে সকল অদ্ভুত ঘটনার রহস্য বাহির করিয়াছেন তাহাই পুস্তকাকারে উক্ত নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহা যে পাঠকগণের জানিতে বিশেষ কৌতূহল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

'প্রতিকার' পত্রিকার ১৬ বৈশাখ ১৩০০ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় লেখা আছে "প্রিয়নাথবাবুর অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এখানি (কুলসম) বঙ্গীয় পাঠকের পক্ষে আমোদজনক সন্দেহ নাই। মাসে মাসে এইরূপ এক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে।"

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল তারিখের 'হোপ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল — "Babu Priyanath Mukherjee is well known to the public as a writer of Popular Detective Stories and his latest volume KULSAM sustains his previous reputation. The publisher of the present volume is going to bring out a series of Detective Stories written by the same author in monthly volumes with the annual subscription of Re 1 and *ans* 8. We hope that the

দোষ না থাকিলেও লেখকের প্রতি অন্যায় কটাক্ষ প্রদান করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। এইসকল অবস্থা দেখিয়া আমি এরূপ পন্থা অবলম্বন করিব মনে করিয়াছি যে, তাহাতে তাঁহারা প্রকৃত ও কল্পিত ঘটনাদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হন।" (তৃতীয় বৎসরের ভূমিকা)

উপায়? "পাঠকগণ পাছে প্রকৃত ঘটনাকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃত ঘটনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত এখন হইতে আমি নিয়ম করিলাম, যে সকল প্রবন্ধ পূর্বের ন্যায় প্রথম পুরুষে বক্তাভাবে লিখিত হইবে, তাহার সমস্তই প্রকৃত ঘটনা। কেবল অধিকাংশ স্থলে নাম ও ঠিকানার পরিবর্তন থাকিবে মাত্র। প্রথম পুরুষ ব্যতিরেকে যে সকল ঘটনা লিখিত হইবে, তাহার সমস্তই অপ্রকৃত, স্বকপোলকল্পিত, অথবা ইংরাজি বা অপর কোনো গ্রন্থের ভাবাবলম্বনে লিখিত হইবে।"

এই যে বিভাজন, এতো দারোগার দপ্তরের পাঠকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী। প্রিয়নাথের বক্তব্য আবার উদ্ধৃত করা যাক। "আমাকে বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বিভিন্ন রুচির পাঠকগণকে সন্তুষ্ট রাখা, আমাদিগের সদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে।" এতো লেখকের বিনয়ের কথা। তারপরই লিখছেন, "এই দারোগার দপ্তরে যখন দুই-একটি অপ্রকৃত ঘটনা বাহির হইল, তখন সর্বসাধারণে সেই সকল ঘটনাকে প্রকৃত বলিয়া আদরে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমি অপ্রকৃত ঘটনা একবারে পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রকৃত ঘটনারই উপর লক্ষ্য রাখিলাম। যখন ক্রমাগত কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বাহির হইল, তখন আবার প্রিয় পাঠকবর্গের ভিতর অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিলেন; সমস্তই প্রকৃত ঘটনা হইলে চলিবে কি প্রকারে? ইহার ভিতর কতক কল্পিত, কতক বা ইংরাজী ও অপর কোন বিদেশীয় ভাষার গল্প অবলম্বনে লেখা আবশ্যক।" পাঠকবর্গের রুচি বিভিন্নতা ও দারোগার দপ্তরের অসম্ভব জনপ্রিয়তা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে ধারাবাহিকভাবে 'দারোগার দপ্তর' লিখতে সাহায্য করেছিল।

জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ যখন এলই, উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করে ক'টি কথা। বাণীনাথ নন্দী জানাচ্ছেন, "পরমেশ্বরের ইচ্ছায় উত্তরোত্তর ইহার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে; সুতরাং সাধারণ লোকে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও আদর-যোগ্যতা যে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এদেশে প্রেম-ভালোবাসার কাল্পনিক গল্প পুস্তকের প্রচার ও আদর অধিক, যে দেশের লোকে কল্পনার অতিরঞ্জিত চিত্র দেখিয়া ভাষা উপেক্ষা করিয়া, কেবলমাত্র গল্প পাঠেই মনোবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন, সেদেশে দারোগার দপ্তরের মতো প্রণয় রসবিহীন উৎকট বীভৎস রসপূর্ণ এতদ্দেশীয় চরিত্র-চিত্রপূর্ণ গল্প পুস্তকের আদর যে এত শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সহজে আশা করা যায় না। বাঙ্গালা ভাষায় এ পুস্তকের নূতনত্ব দৃষ্টি করিয়াই হউক, বা আনন্দের ঘটনা সন্নিবেশ বৈচিত্র্যেই হউক, এ পুস্তকের আদর ও প্রচারবৃদ্ধি শুভলক্ষণ বলিতে হইবে।"

প্রেম, প্রণয় ইত্যাদি কোমলাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত শুধুমাত্র রহস্যগল্প যে ধারাবাহিকভাবে বেরোতে পারে এ ভাবনা সম্ভবত লেখক, কার্য্যাধ্যক্ষ কারোরই ছিল না। বাংলা সাহিত্যের পাঠক যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে গোয়েন্দা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই কার্য্যাধ্যক্ষ এমনও দাবি করেছেন, "আমরা যে কিয়ৎ পরিমাণে উপন্যাস পাঠকের রুচি ভিন্ন দিকে ফিরাইতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।"

অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করছে 'দারোগার দপ্তর' এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত প্রকাশকের মন্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, যে 'দারোগার দপ্তর' শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দেশীয়, বিদেশীয়, বাঙালি, আসামী, হিন্দুস্থানী, উড়িষ্যাবাসী, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, ইংরাজ প্রভৃতি বহুবিধ ব্যক্তিগণের কাছে আদর যত্ন পেয়েছে, সকলকেই সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে; এটাও যথেষ্ট গৌরবের কথা।

এমনও জানা গেছে, কেউ কেউ বলেছেন, দারোগার দপ্তর পাঠ করে পুলিশ কর্মচারী চুরি, জুয়াচুরি ধরার কৌশল শিখে থাকেন। চোর জুয়াচোররা তাদের উদ্ভাবিত উপায় কৌশল যাতে ধরা না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হয়। কিন্তু এও শোনা গেছে, অনেক পল্লীগ্রামের পাঠক দারোগার দপ্তরে প্রকাশিত চুরি জুয়াচুরির কৌশল পাঠ করে সতর্ক ও সাবধান হয়ে অনেক সময় জুয়াচোরের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন।

প্রত্যেক বছর দারোগার দপ্তরের সূচনায়, বৈশাখ মাসে ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সর্বসিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা বাড়াতে মনোযোগ দিয়েছেন। পাঠক মনোরঞ্জনের দিকেও তাঁরা দৃষ্টি দিয়েছেন।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ দারোগার দপ্তরের প্রকাশক বাণীনাথ নন্দী তাঁর মন্তব্যে জানিয়েছেন, "আমাদের এক্ষণে এরূপ ভরসা আছে যে, প্রিয়নাথবাবু ও আমার জীবিতকাল পর্যন্ত ইহার অস্বিস্ত লোপ হইবে না; তবে ইতিমধ্যে অন্য কোন অনিবার্য দৈব-দুর্ঘটনার সংঘটন হইলে আমরা নাচার।"

ভাবতে অবাক লাগে, যে দৈব দুর্ঘটনার সংকেত বাণীনাথ নন্দী দিলেন, সেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল এক মাসের মধ্যেই। ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শিরোনামে দারোগার দপ্তরের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপিত করেছেন, "বিশেষ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে , দারোগার দপ্তরের সহিত এতদিবস পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তবাবু বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের যে সংস্রব ছিল, অদ্য হইতে তাঁহার সেই সংস্রব বিলুপ্ত হইল। কতকগুলি কারণে বাধ্য হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে দারোগার দপ্তরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া, অদ্য হইতে নূতন কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে সেই গুরুভার অর্পণ করিলাম। অদ্য হইতে দারোগার দপ্তরের সহিত বাণীবাবুর আর কোনরূপ সংস্রব রহিল না।"

উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী প্রিয়নাথের বিজ্ঞপ্তির পাদদেশে জানিয়েছেন, "অদ্য হইতে আমি দারোগার দপ্তরের কার্য্যাধ্যক্ষের গুরুভার গ্রহণ করিলাম। এখন হইতে টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিনিময়-পত্রিকা প্রভৃতি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। ভূতপূর্ব কার্য্যাধ্যক্ষের সময়ে যাঁহার যে কোন অভিযোগ থাকে, তাহা আমাকে লিখিলেই আমি পত্র পাইবামাত্র তাহার প্রতিকার করিব। গ্রাহকগণ পত্রে গ্রাহকের নম্বর লিখিয়া দেবেন। গ্রাহক নম্বর না থাকিলে, সেই পত্রের কোন কার্য হয় না, ইহা যেন গ্রাহকগণের বিশেষ স্মরণে থাকে।" ঠিকানা লেখা ছিল — ৭৯/৩/২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা। পরবর্তী সময়ে ১৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, ১৪নং হুজুরিমলস লেন, বৈঠকখানা এবং ৮৮/১ কেরানিবাগান ইস্টলেন ঠিকানা দারোগার দপ্তরের কার্যালয় ও প্রাপ্তিস্থান হিসেবে ছাপা হয়েছে।

ঠিকানা বদলে গেল। কার্য্যাধ্যক্ষ বদলে গেল। লেখক কিন্তু একই ব্যক্তি রয়ে গেলেন। কারণ "এই দপ্তরে প্রিয়বাবু ব্যতীত অপর কাহারও একছত্র লিখিবার অধিকার নাই। প্রিয়বাবু সরকারি কার্যের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া সেই কার্য সমাপনান্তর পুনরায় এই দপ্তর নিয়মিতরূপে যে লিখিতে সমর্থ হন, ইহাই আশ্চর্য।" জানিয়েছেন উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী মহাশয়। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, দারোগার দপ্তরের জন্য পাঠক রীতিমতো লালায়িত ছিল। আর তার ফল? পথে চুরি হয়ে যেত গ্রাহকের দারোগার দপ্তর।

দারোগার দপ্তর প্রণেতা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় একবার 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে পাঠকদের জানালেন, "আজকাল আমাদের দারোগার দপ্তরের অনুরূপ অনেক পত্রিকা প্রভৃতিতে ডিটেকটিভের গল্প বাহির হইতেছে; সেই দেখিয়া যথায় তথায় বিস্তর লোক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তদ্বিষয়ে রাশি রাশি পত্রও আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, যে, সেই সকল গল্প আমার লেখা কিনা। অতএব সাধারণের অবগতির জন্য আমি এই বিজ্ঞাপন দিয়া প্রকাশ্যে বলিতেছি যে, এই 'দারোগার দপ্তর' ব্যতীত অন্য কোন পত্রে বা পুস্তকে যে কিছু ডিটেকটিভ গল্প ছাপা হইতেছে তাহার সহিত আমার কোনও সংস্রব নাই। 'দারোগার দপ্তর' ভিন্ন অন্য কোনো পুস্তক বা পত্রিকায় আমার লেখা থাকে না। যদি কিছুতে থাকে, তবে তাহাতে আমার নাম থাকিবে। নাম না থাকিলে তাহা আমার লিখিত নয় জানিবেন।"

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সৃষ্ট দারোগার দপ্তর-এর জনপ্রিয়তা কেমন ছিল? এটাও বোঝা যাচ্ছে, তৎকালীন পাঠক রহস্যকাহিনীর বেড়াজালকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ভাবতেন, রহস্য গল্প মানেই প্রিয়নাথের লেখা। দারোগার দপ্তরের সাফল্যের এও এক মাইলস্টোন।

'দারোগার দপ্তর'-এর কিছু নিয়ম ছিল। নিয়মগুলি নিম্নরূপ—

১। কি সহরে কি মফস্বলে দারোগার দপ্তরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে দারোগার দপ্তর পাঠান হয় না। ভ্যালু-পেয়েবল পাঠাইতে হইলে দুই আনা অধিক লাগে।

২। প্রতিমাসে এক একটি ডিটেকটিভ গল্প শেষ হইবে; সুতরাং প্রতি মাসের সমান আকার হইবে না; কোন মাসে ৪৮, কোন মাসে ৫২, কোন মাসে ৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে। এক বৎসরে বারো সংখ্যায় ৬০০ পৃষ্ঠার অধিক হইবে। প্রতি খণ্ডের বা নমুনা পুস্তকের নগদ মূল্য তিন আনা, ডাকমাশুল অর্ধ আনা স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দারোগার দপ্তর প্রকাশিত হইবে। কেহ কোন মাসে পুস্তক না পাইলে সেই মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে জানাইবেন। কোন মাসের পুস্তক না পাইবার কথা জানাইলে, তাহার পর মাসের পুস্তকের সহিত সেই পুস্তক প্রেরিত হইবে।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় জানিয়েছেন, ''লেখক বলিয়া জনসমাজে আত্মপরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে; কেবল বন্ধুবর্গের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'' যে দুঃসাহসিক কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের ধারাতে পথিকৃতের মর্যাদা পেল। এটাও কম কথা নয়।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা দরকার। ডিটেকটিভ পুলিশের বিভিন্ন খণ্ডের লেখাগুলি পরবর্তী সময়ে দারোগার দপ্তরে সংযোজিত হয়। এখানেও গ্রাহকদের চাহিদার কথাটিও আবার আসছে। প্রকাশকের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, ''ডিটেকটিভ পুলিশের অপরাপর খণ্ডগুলিও ক্রমে এই দারোগার দপ্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া ঐ সকল গ্রাহকদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করিব না, এইরূপ ইচ্ছা রহিল।''

মোট সংখ্যায় দারোগার দপ্তর কতগুলো বেরিয়েছিল? জানা যায়, ২০৬টি। অর্থাৎ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসই শেষ দারোগার দপ্তরের প্রকাশকাল হিসেবে ধরা যেতে পারে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে দারোগার দপ্তর বেরোয়নি। অবশ্য তাতে দপ্তরের সংখ্যা সূচকে কোন অসুবিধা ঘটেনি।

অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত গিরিশচন্দ্র বসু রচিত 'সেকালের দারোগার কাহিনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (জানুয়ারি ১৯৮৩) ভূমিকা লেখক অলোক রায় জানিয়েছেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে (পৃ. ৭)। এর আগে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পেয়েছে প্রিয়নাথের লেখা আত্মজীবনী 'তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী'। দেখা যাচ্ছে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুকাল নিয়ে একটা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান জানিয়েছে, সালটা ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ, অলোক রায় জানিয়েছেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ, 'বঙ্গসাহিত্যাভিধান'-এ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে এবং সুকুমার সেন জানিয়েছেন, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। বিতর্কটা থেকেই যাচ্ছে।

কিন্তু প্রিয়নাথের জন্মসন নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দেই তাঁর জন্ম। ২০০৪-এ তাঁর জন্মের দেড়শো বছর উপলক্ষে আমরা 'দারোগার দপ্তর' প্রকাশ করতে চলেছি। বইয়ের আকার বড়ো হয়ে যাওয়ার কারণে এবং পাঠকদের বইটি ব্যবহারের সুবিধার্থে আমরা দারোগার দপ্তরকে দুটি খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একশোটি দপ্তর আশা করি এই প্রজন্মের কাছে বাংলা সাহিত্যের এক দুষ্প্রাপ্য অধ্যায়কে তুলে ধরতে পারবে। দু বছরেরও বেশি সময় ধরে দারোগার দপ্তর সংগ্রহ করেছি। এ ব্যাপারে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন কলকাতার হিরণ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক গোপালচন্দ্র দে। তাঁর সহৃদয় সাহায্য না পেলে দারোগার দপ্তর নতুনভাবে প্রকাশ করা যেত না। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। চৈতন্য লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক সৌমেন সেন ও সম্পাদক বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায় দারোগার দপ্তরের অনেক সংখ্যা দেখতে দিয়েছেন ও প্রয়োজনে লিখতে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা। ছেঁড়া পাতা, পোকায় কাটা পাতা দেখে দেখে আমাকে সম্পাদনা করতে সাহায্য করেছেন আমার স্ত্রী আলো মুখোপাধ্যায় ও কন্যা তিথি।

'দারোগার দপ্তর' গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী নিখিল সরকারের কাছে। তাঁর নির্দেশেই এ কাজ আমি করতে শুরু করি। প্রতি মুহূর্তে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদের কাজে লেগেছে। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। সন্দীপ নায়ক 'পুনশ্চ'র পক্ষে এই বই প্রকাশ করছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। বাংলা ভাষার পাঠক যদি 'দারোগার দপ্তর' পড়ে শতবর্ষ পূর্বের গোয়েন্দা গল্প সম্পর্কে পরিচিত হন তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

মোক্তারপাড়া,
চন্দননগর, হুগলি
কলকাতা বইমেলা, ২০০৪

অরুণ মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

যমালয়ের ফেরতা মানুষ ☐ ১৩

অদ্ভুত-হত্যা ☐ ২২

চোরের গাড়ি চড়া ☐ ৩৬

কৃত্রিম-মুদ্রা ☐ ৩৮

কুল্‌সম ☐ ৪৫

আসমানী লাস (ভয়ানক লোমহর্ষণকর অদ্ভুত ঘটনা!!) ☐ ৬১

চোরের উপর!! (অতি অদ্ভুত অনুসন্ধান কাহিনী!) ☐ ৭৬

শঠে শঠে (কুটিল কৌশলের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত!) ☐ ৯১

মার ধন চুরি (ধনী-পুত্রের প্রেমের দায়!) ☐ ১০৫

হত্যারহস্য (খুনীকে গুম করিবার চেষ্টা) ☐ ১১৮

কাটামুণ্ড (বেওয়ারিস মালের অনুসন্ধান!) ☐ ১৩২

বামুন ঠাকুর (বিদ্যার অভাবে অবিদ্যার প্রভাব) ☐ ১৪৪

এ কি ! খুন !! (ছোরাবিদ্ধ স্ত্রীর সহিত ধৃত স্বামীর আশ্চর্য্য রহস্য) ☐ ১৫৬

বিষম সমস্যা (হৃত সর্বস্বা বারাঙ্গনার মৃতদেহের অদ্ভুত রহস্য!) ☐ ১৭৩

বলিহারি বুদ্ধি! (কোন গুপ্তহত্যার গূঢ় রহস্যভেদ ও চোরের স্ত্রীর অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব)

অবীর-জান (কামিনীর কুটিলচক্র ভেদ) ☐ ১৮৮

গিরিজাসুন্দরী (রাজধানীর রাজবর্ত্মে রমণী হত্যা) ☐ ২০২

প্রমদা (কুলবধূ ব্যভিচারে ঘটায় প্রমাদ!) ☐ ২১৮

বাঃ গ্রন্থকার! (অর্থাৎ পুস্তক-প্রণেতার অদ্ভুত জুয়াচুরি রহস্য!) ☐ ২৩৩

যেমন তেমনি (অর্থাৎ, চতুর পালিত পুত্রের বিদ্যা প্রকাশ!!) ☐ ২৪৬

নিরুদ্দেশ ভাই (অর্থাৎ উত্তরাধিকারী পুত্রের বিষয় প্রাপ্তির আশ্চর্য রহস্য?) ☐ ২৬০

অর্থই অনর্থ (অর্থাৎ অর্থলাভে বিশ্বস্ত বন্ধুর সর্ব্বনাশ!) ☐ ২৭৪

চতুর চোর (অর্থাৎ প্রচুর পাহারার ভিতরেও চুরি করার রহস্য!) ☐ ২৮৮

ইংরেজ ডাকাত (১) (হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন দস্যুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত) ☐ ৩০৪

ইংরেজ ডাকাত (২) (হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন দস্যুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত) ☐ ৩১৭

ডাক চোর (পোস্ট-আফিসের ডাকপত্র ও মণি-অর্ডারাদি হরণ-রহস্য) ☐ ৩২৯

সিঁদেল চোর (একটি প্রসিদ্ধ মুসলমান চোরের জীবন কাহিনী) ☐ ৩৪৫

মুণ্ডচুরি (অর্থাৎ একটি মস্তকহীন মনুষ্যের আশ্চর্য্য রহস্য!) ☐ ৩৭৭
এ আবার কি! (অর্থাৎ আত্মহত্যা না খুন?) ☐ ৩৯২
কাপ্তেন মতি (অর্থাৎ নোট জালকারীর অদ্ভুত রহস্য) ☐ ৪০৫
স্ত্রী কি পুরুষ? (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্নবিশিষ্ট লাসের টুক্‌রার ভয়ানক আশ্চর্য্য রহস্য!) ☐ ৪১৯
ঘটনা-চক্র (অর্থাৎ দ্বীপান্তরিত কয়েদীর অদ্ভুত আত্মত্যাগ কাহিনী) ☐ ৪৩৩
বালক চুরি (বালক চুরির ও ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের অত্যদ্ভুত রহস্য!) ☐ ৪৪৮
চোরের বুদ্ধি (অর্থাৎ চরিত্রহীনের তীক্ষ্ণবুদ্ধির দৃষ্টান্ত রহস্য!) ☐ ৪৬২
নীলে কয়লা (অর্থাৎ জুয়াচোরের অদ্ভুত সাহস!) ☐ ৪৭৪
পিতৃ-শ্রাদ্ধ (''কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামন মরে!'') ☐ ৪৯১
এ কি পিতৃ-হত্যা? (অর্থাৎ পিতৃ-হত্যাপরাধে অভিযুক্ত পুত্রের অদ্ভুত রহস্য!) ☐ ৫০৫
বেকুব বৈজ্ঞানিক (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকের চক্ষুতে অজ্ঞলোকের ধূলিনিক্ষেপের অদ্ভুত রহস্য!) ☐ ৫২০
পুলিস-বুদ্ধি (অর্থাৎ সামান্য পুলিস কর্মচারীর বুদ্ধিবলে সেসন জজের রায় পরিবর্তনের আশ্চর্য রহস্য!) ☐ ৫৩৪
চক্রভেদ (অর্থাৎ কুটিল চক্রীদিগের মন্ত্রভেদে অসমর্থ হইলেও ঘটনাচক্রে সমস্ত প্রকাশের রহস্য!) ☐ ৫৪৯
পথে খুন! (১) (অর্থাৎ রাজবর্ত্মে গাড়ির ভিতর হত্যা ও তৎ হত্যাকারী ধৃত করিবার অদ্ভুত কৌশল!) ☐ ৫৬৫
পথে খুন! (শেষ অংশ) (অর্থাৎ রাজবর্ত্মে গাড়ির ভিতর হত্যা ও তৎ হত্যাকারী ধৃত করিবার অদ্ভুত কৌশল!) ☐ ৫৮২
জুয়াচুরি (অর্থাৎ জুয়াচোরদিগের অত্যাশ্চর্য্য অভেদ্য কতিপয় কার্য্য-কৌশল!) ☐ ৫৯৭
পালোয়ানী চুরি (অথবা যেমন চোর, তেমনই পুলিশ!) ☐ ৬১১
হিন্দু রমণী (অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত একটি সতীর আশ্চর্য্য স্বামীভক্তি!) ☐ ৬২৫
রেলে যম (অর্থাৎ রেলওয়ে যাত্রীর মহাদুর্ঘটনার একটি লোমহর্ষণকর দৃষ্টান্ত!) ☐ ৬৪১
ডাকাত সর্দ্দার (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দস্যু দলপতি কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর বীভৎস কাহিনী) ☐ ৬৫৫
কি ভয়ানক! (অর্থাৎ সিঁদ-চুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধানে অদ্ভুত ভয়াবহ রহস্য প্রকাশ) ☐ ৬৬৯
চোর চৌঘুড়িতে [অর্থাৎ ভদ্র(!) চোরের সাহসকে বলিহারি!] ☐ ৬৮৩
কৃপণের দণ্ড (অর্থাৎ অর্থের নিমিত্ত কৃপণের যে কিরূপ পরিণাম হয় তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!) ☐ ৬৯৮

যমালয়ের ফেরতা মানুষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেখ নসিরুদ্দিন এখন ভবানীপুরের একজন মধ্যবিত্ত প্রজা। গত তিন বৎসর হইতে কন্ট্রাক্টের কর্ম করিয়া, যেমন করিয়া হউক, তিনি দশ টাকার সংস্থান করিয়াছেন। তিনি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থানায় আসিয়া যেরূপ এজাহার দিতেছেন, তাহার সারমর্ম এই স্থানে পাঠকগণকে অবগত করাইব। নসিরুদ্দিন বলিতেছেন, 'প্রায় তিন মাস অতীত হইল, আমি একজন পোদ্দারকে প্রায় ছয় সাত শত টাকা মূল্যের কতকগুলি সোনার অলঙ্কার নির্মাণ করিতে দিয়াছিলাম; অনেকবার তাগাদা করিয়াও সেই সকল গহনা আমি আর পাই নাই। কিন্তু অদ্য দিবা ১০টার সময় যখন আমি আফিস-অঞ্চলে যাইতেছিলাম, সেই সময়ে পোদ্দার আমাকে ডাকিল ও তাহার দোকান হইতে সমস্ত গহনাগুলি আমাকে প্রদান করিয়া বলিয়া দিল যে, "বিশেষ কার্যোপলক্ষে অদ্য আমি দেশে যাইতেছি, প্রায় দুই তিন মাস ভিন্ন ফিরিয়া আসিতে পারিব না, এখন আপনি গহনাগুলি লইয়া যান; আমি ফিরিয়া আসিয়া হিসাব-পত্র করিয়া দেনাপাওনা স্থির করিব।" পোদ্দারের এই কথা শুনিয়া আমি গহনাগুলি গ্রহণ করিলাম ও কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, 'গহনাগুলি সঙ্গে করিয়া আফিস-অঞ্চলে যাই, কি আবার বাটী ফিরিয়া গিয়া উহা রাখিয়া আসি।' আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় গোলাম হোসেনের পুত্র কাছেম আলিকে আসিতে দেখিতে পাইলাম। উহাকে অনেক দিবস হইতে ভাল লোক বলিয়া জানিতাম; বিশেষত আমার বাটীর নিকটে উহার বাসস্থান। আমি কাছেম আলিকে ডাকিলাম; সে নিকটে আসিল। আমি গহনাগুলি তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়া দিলাম, "তুমি ইহা লইয়া আমার বাটীতে গিয়া আমার ভ্রাতার নিকটে দিও।" সে সম্মত হইল ও গহনাগুলি লইয়া সেই স্থান হইতে আমাদিগের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। আমিও আফিস-অভিমুখে গমন করিলাম। সন্ধ্যার সময় বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া গহনার কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, কাছেম আলি কোন গহনা আনিয়া বাড়িতে দেয় নাই। পরে কাছেম আলির অনুসন্ধান করিলাম এবং তাহার বৃদ্ধ পিতা গোলাম হোসেনের নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, সে গুরুদর্শন অভিলাষে কল্য বাটী হইতে গমন করিয়াছে। গহনার কথা জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ গোলাম হোসেন তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার গুরুদেব যে কে এবং কোথায় থাকেন, তাহাও আমরা কেহই অবগত নহি। এখন মহাশয়েরা একটু অনুগ্রহ না করিলে আর আমার কোনরূপ উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি আপনারা সন্ধান করিয়া উহাকে না ধরেন, তাহা হইলে আমার ছয় শত টাকা একেবারে লোকসান হইয়া যাইবে এবং দোষী ব্যক্তিরও উপযুক্ত দণ্ড হইবে না। আমি উহার উপর বিশ্বাসঘাতকতা-দোষ আরোপ করিয়া নালিশ করিতেছি, এখন আপনাদিগের যাহা কর্তব্য হয়, করুন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুলিস-কর্ম্মচারী তদারকে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে কাছেম আলির বাটীতেও গমন করিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা গোলাম হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোলাম হোসেনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন কথারই পরিষ্কার উত্তর দিতে পারিলেন না; তবে এইমাত্র বলিলেন যে, কাছেম আলির একজন গুরু (ফকির) আছেন, সে তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কল্য এই স্থান হইতে গমন করিয়াছে। সে ফকির কে, কোথায় থাকেন বৃদ্ধ তাহার কিছুই বলিতে না পারায় পুলিস-কর্ম্মচারীর মনে নানারূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। যে ব্যক্তি গুরু-দর্শনাভিলাষে কল্য গমন করিয়াছে, সে অদ্য কিরূপে নসিরুদ্দিনের নিকট হইতে অলঙ্কার-সকল লইয়া গমন করিতে সমর্থ হইল? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। সম্ভবত বৃদ্ধও ইহার কিছু না কিছু ব্যাপার অবগত আছে। এই ভাবিয়া তিনি গোলাম হোসেনের গৃহ অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ প্রথমে অসম্মত হইল; কিন্তু তাহার আপত্তি টিকিল না দেখিয়া, কাজেই তাহাকে সম্মত হইতে হইল। পাড়ার দুই তিন জন ভদ্রলোককে ডাকাইয়া পুলিস-কর্ম্মচারী তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং বৃদ্ধকে কহিলেন, 'তোমার নিজের ও পরিবারবর্গের যে সকল অলঙ্কারাদি আছে, তাহা প্রথমে আমাদিগের সম্মুখে লইয়া আইস। তাহার পর বিবেচনামত কার্য করা যাইবে।' এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ তাহার পরিবারবর্গের অলঙ্কারগুলি আনিবার মানসে, যে সিন্দুকের ভিতর উক্ত দ্রব্য সকল রক্ষিত ছিল, তাহার নিকট গমন করিল। সেই স্থানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বৃদ্ধের মস্তক ঘুরিয়া গেল, চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। পুলিস-কর্ম্মচারী বৃদ্ধের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হঠাৎ তোমার এরূপ

অবস্থা হইল কেন?' তখন গোলাম হোসেন ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, 'আর বলিব কি মহাশয়! আমারও সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে; দেখুন, আমার এই সিন্দুকের তালা খোলা রহিয়াছে এবং কাছেম আলির বৃদ্ধ মাতা ও তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সও নাই।' এই বলিয়া বৃদ্ধ অধীর বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল; কপালে করাঘাত ও আর্তনাদ করিতে করিতে কহিল, 'এখন বোধ হইতেছে, কাছেম আলি আমারও সর্বনাশ করিয়াছে। সেই আমার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া আমার এত দিবসের সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এখন বোধ হইতেছে, কাছেম আমার পুত্র নহে। এত দিবস হইতে সে আমার সর্বনাশ-সাধন করিবার মানসেই আমাকে ছলনা করিয়া আমার পুত্র-পরিচয়ে আমার নিকটে অবস্থিতি করিতেছিল। আজ দেখিতেছি যে, সে আমার সর্বনাশ সাধন করিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমারই সর্বনাশ-সাধনের নিমিত্ত মায়াজাল বিস্তার করিয়া সে আমাকে মোহজালে আবদ্ধ করিয়া ছিল; তাহার সেই মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি প্রভৃতি এখন দেখিতেছি, ছলনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

পুলিস-কর্ম্মচারী ইহা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন ও বার বার কহিলেন, 'কাছেম আলি যে তোমার পুত্র নহে বলিতেছ, ইহার অর্থ কি?' এই কথায় বৃদ্ধ যাহা বলিল, তাহা শুনিলে চমকিত হইতে হয়; তাহা বড়ই অদ্ভুত কথা। বৃদ্ধ বলিল, 'এখন আমার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছে। যখন আমার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর, সেই সময়ে অনেক ঈশ্বরারাধনার পর আমি একটি মাত্র পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এত দিবস পরে ঈশ্বরের কৃপায় আমার যাহা কিছু বিষয়াদি আছে, তাহা উপভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র পাইলাম। কিন্তু আমার সে আশা অতি অল্পদিন মধ্যেই নির্ম্মূল হইল। উহার বয়ঃক্রম ছয়মাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আমাদিগের সকল ভরসার স্থল সেই একমাত্র পুত্র শমন-সদনে প্রস্থান করিল। আমরা অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে করিতে আমাদিগের ধর্ম্মানুযায়ী উহার সমাধি-কার্য সমাধা করিলাম ও হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত দুঃখের প্রতিকৃতি দর্শন করিতে করিতে আরও প্রায় পনর-ষোল বৎসর যাপন করিলাম। প্রায় চারি বৎসর হইল, একদিন আমি সন্ধ্যার সময় আমি আমার 'দলিজে' বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছি, এমন সময় উক্ত কাছেম আলি, যাহার বয়স তখন ষোল বৎসর, ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিল এবং ভক্তিভাবে প্রণামপূর্বক আমাকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিল, 'পিতঃ! আমি আসিয়াছি।'

আমি উহার কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাপু, তুমি কে, আমাকে পিতৃ-সম্বোধন করিলে?' তাহাতে কাছেম আলি বলিল, 'পিতা! আমার নাম কাছেম আলি, আমি আপনার পুত্র। আপনার বোধ হয় মনে আছে যে প্রায় ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইল, আপনার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে; আমি আপনার সেই সন্তান। আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তিনি আমার নাম কাছেম আলি রাখিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক দিবস তাঁহার ক্রোড় হইতে আমি পড়িয়া যাওয়াতে, আমার কপালের এক স্থান কাটিয়া গিয়াছিল। দেখুন, আমার কপালের সেই দাগ অদ্যাপিও বর্তমান আছে।' এই কথা শুনিয়া আমি ঈশ্বরের নাম ভুলিয়া গেলাম; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। সে পুনরায় বলিতে লাগিল, 'পিতা! যখন আমার বয়ঃক্রম কেবল ছয় মাস মাত্র হইয়াছিল, সেই সময় আমার অতিশয় পীড়া হয়; তাহাতে সকলেই মনে করেন যে, আমি মরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক আমি মরি নাই। মৃত মনে করিয়া আপনারা আমাকে কবরে প্রোথিত করেন। কিন্তু সেই সময় একজন ফকির সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সকল অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। আপনারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিলে, তিনি আমাকে কবর হইতে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যান ও বহুযত্নে আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করেন। আর ইহাও আপনার বোধহয় বেশ মনে আছে যে পরদিবস প্রাতঃকালে আপনি কবর দেখিতে গিয়া পুনঃখনিত অবস্থায় দেখিতে পান। তাহাতে শৃগাল কর্তৃক এইরূপ অবস্থা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, আপনি স্বহস্তে উহা ঠিক করিয়া দেন। গত ষোল বৎসর পর্যন্ত সেই ফকিরের যত্নে আমি প্রতিপালিত হইয়া এত বড় হইয়াছি, নানা দেশ-দেশান্তরে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই সকল গূঢ় রহস্যও তাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি। প্রায় একমাস অতীত হইল, ফকির সাহেব এলাহাবাদের নিকট একটি পর্বতে গমন করিয়াছেন। তিনি সেই স্থানে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন মনস্থ করিয়াছেন এবং আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাকে বলিয়া দিয়াছেন,— তুমি যদিও এখন সংসারে প্রবেশ করিতে চলিলে, কিন্তু একবারে সংসারের মায়ায় অভিভূত হইও না, মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আর তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকেও বলিও যে, কোন না কোন সময়ে আমি যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিয়া আসিব।'

এই সকল কথা শুনিয়া আমার চক্ষু দিয়া দরদর বেগে জল পড়িতে লাগিল। আমার অন্তরের সহিত সমস্ত কথা মিলিল দেখিয়া, আমি আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম। সেও বাহিরে আসিয়া সকল শুনিয়া তাহার কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিল এবং কাছেম আলির মুখ-চুম্বন করিয়া যত্নের সহিত তাহাকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। আমিও ঈশ্বরের এই অনুগ্রহে হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। ক্রমে পাড়ার লোকজন আসিয়া তাহাকে দেখিল ও সকলেই

তাহার কথায় একান্ত বিশ্বাস করিল। সেই দিবস হইতেই আমি উহাকে আমার পুত্র জানিয়া অন্তরের সহিত যত্ন ও এত দিবস ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছিলাম; সদ্বংশজাত সুপাত্রীর সহিত উহার বিবাহও দিয়াছিলাম। এই তাহার স্ত্রী; এই তাহার দুইটি পুত্র। সে প্রায়ই দুই চারি মাস অন্তর সেই ফকিরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশ-পঞ্চাশ টাকা লইয়া এলাহাবাদের নিকট কোন পর্বতে গমন করে এবং দশ পনের দিবস তথায় থাকিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে। গত কল্য সেইরূপই গিয়াছে, কিন্তু এবার স্ত্রী ও মাতার গহনাগুলি লইয়া গিয়াছে, বোধ হইতেছে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুলিস-কর্ম্মচারী এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, বৃদ্ধ গোলাম হোসেন মিথ্যা কথা বলিতেছে। কিন্তু পরে গোলাম হোসেনের স্ত্রী ও প্রতিবেশীবর্গের নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার সে বিশ্বাস দূর হইল। তিনি আবশ্যক অনুযায়ী অন্যান্য সমস্ত অনুসন্ধান শেষ করিলেন এবং আসামী কাছেম আলির অনুসন্ধান করিতেও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তাহার কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে গিয়া অপর কতকগুলি অভূতপূর্ব বিষয় বাহির হইয়া পড়িল। এক মোকদ্দমার স্থানে দুইটি মোকদ্দমা কাছেম আলির বিরুদ্ধে উপস্থিত করিতে হইল। পুলিস-কর্ম্মচারী একাদিক্রমে দুই তিন দিন কাছেম আলির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া আসামীর গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট বাহির করাইবার প্রত্যাশায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন; মোকদ্দমার সমস্ত ঘটনা সবিশেষ বিবৃত করা হইল; ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর সমস্ত শুনিয়া আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট বাহির করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ওয়ারেন্ট বাহির হইল। তখন সেই ওয়ারেন্ট ডাক যোগে এলাহাবাদে প্রেরিত হইল; কিন্তু সেই স্থানে কাছেম আলির কোন সন্ধান না হওয়ায় ওয়ারেন্ট ফেরৎ আসিল।

এই সময় একদিবস সাহেব আমাকে ডাকাইলেন। উক্ত মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা আমাকে বলিয়া দিলেন ও সেই আসামীকে ধরিবার নিমিত্ত সেই ওয়ারেন্ট আমাকেই প্রদান করিলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে ওয়ারেন্ট হস্তে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। দুই তিন দিন নানাস্থানে তাহার সন্ধান করিলাম, কিন্তু কেহই তাহার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। ভবানীপুরেও তাহার সন্ধানের ত্রুটি হইল না। যখন দেখিলাম, তাহার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তাহার সন্ধান পরিত্যাগ পূর্বক তাহার সমবয়স্ক বন্ধুবর্গের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরিশেষে আবদুল নামক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট অবগত হইলাম যে, কাছেম আলি প্রায়ই কলিকাতার ভিতর মেছুয়াবাজার নামক স্থানে গমন করিত, আবদুলও পাঁচ সাত দিবস তাহার সহিত গমন করিয়াছিল। মেছুয়াবাজারে তাহার অনেক পরিচিত লোক আছে; সে সেই স্থানে গমন করিলে কত লোক আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিত এবং কোন কোন ব্যক্তি তাহার সহিত গোপনেও নানারূপ কথাবার্তা বলিত।

এই সংবাদ পাইয়া আবদুলকে সঙ্গে লইয়া সেই দিবস সন্ধ্যার সময় মেছুয়াবাজারে গিয়া কাফিখানায় বসিলাম। বসিয়া বসিয়া কাফিখানার অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। মেছুয়াবাজারের "কাফিখানা" ও "খন্‌চা" অতি অদ্ভুত স্থান। ভারতবর্ষের ভিতর এরূপ যে আর কোন স্থান আছে, তাহা বোধ হয় না। সেই স্থানের প্রকৃত বর্ণনা করিতে হইলে বৃদ্ধ বাল্মীকিকে ডাকিতে হয়, নতুবা তাহার যথার্থ বর্ণনা আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে না, আমার তো কথাই নাই। কারণ, সত্যকে মিথ্যা করিয়া যে লোক উদরান্নের সংস্থান করে, তাহার সাধ্য কি যে, সে ইহার চিত্র আঁকিতে পারে? তবে যখন লিখিতে বসিয়াছি, আর আপনারাও পয়সা দিয়াছেন, তখন পারি বা না পারি, কতক না বলিলে আপনারা ছাড়েন কই?

মেছুয়াবাজারের মধ্যে এক স্থানে কতকগুলি বড় বড় খোলার ঘর। উহার ভিতর স্থানে স্থানে চীনদেশীয় মৃত্তিকা-নির্মিত কতকগুলি বাসন রহিয়াছে; আর সেই সকল ঘরের ভিতর চতুর্দিকে সারি সারি কাষ্ঠ-নির্মিত বেঞ্চ সকল সাজান রহিয়াছে। কেবলমাত্র ঘরের মধ্যস্থলে কিয়ৎপরিমাণ স্থান খালি আছে। সেই বেঞ্চের উপর নানাদেশীয় মুসলমানগণ সারি সারি বসিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেকের হস্তে একখানি পিত্তলের চামচ ও সম্মুখে কাফি-পরিপূর্ণ পূর্বোক্ত চীনের এক একটি বাসন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত বা সভ্য লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আরব, ইরান, পারস্য বলুন, আফ্রিকা বলুন, পঞ্জাব বলুন, বা কলিকাতা বলুন, যে স্থানের মুসলমানগণ স্বদেশে আপন বদ্‌মাইসীর চরম সীমা দেখাইয়া দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছে, এই সকল তাহাদিগের আমোদের জন্যই স্থাপিত,— এই কাফি তাহাদের জন্যই প্রস্তুত। নতুবা যে দ্রব্যের যথার্থ মূল্য কেবল দুই আনা মাত্র, তাহার মূল্য আট আনা কে দিতে পারে? যাহাদের পয়সা উপার্জনে কোন কষ্ট নাই, যাহারা হাসিতে হাসিতে নানা কারণে লোকের মস্তকে লাঠি মারিতে পারে, কোন জমিদারে জমিদারে দাড়া-হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে যাহাদের কদর বাড়ে, যাহারা যে কোন ভদ্রলোককে অপমান করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষপক্ষীয়ের নিকট হইতে টাকার বন্দোবস্ত করিয়া লয়, যাহারা চুরিকে ঘৃণা করে না, চোরাই দ্রব্য লইতে সঙ্কুচিত হয় না, যাহারা পুলিশের বা জেলের ভয় করে না এবং যাহাদিগের নিমিত্ত জেলের ভিতর আহারীয়

দ্রব্য সততই প্রস্তুত থাকে এ তাহাদিগেরই স্থান। তাহারাই এই স্থানে কাফি পান করিতেছে, আর সম্মুখের স্ত্রীলোকটির দিকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে, বাহবা দিতেছে ও মধ্যে মধ্যে পকেট হইতে সিকিটা, দুয়ানিটা বাহির করিয়া তাহাকে অর্পণ করিতেছে।

এই স্ত্রীলোটি কে? ইনি একজন মুসলমানী বেশ্যা। কাফিখানার ভিতরই ইঁহার আড্ডা, ইনিই কাফিখানার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাফিখানার অধ্যক্ষ অনেক যত্ন করিয়া, অনেক তোষামোদ করিয়া ইঁহাকে রাখিয়াছে। নতুবা কাফিখানা জমে না, কেহ আসে না; সুতরাং কফি অনেক কম বিক্রীত হইয়া তাহার উপার্জনের বিশেষ অনিষ্ট হয়। ঘরের ভিতর যে খালি স্থানটির কথা বলিয়াছি, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এই স্ত্রীলোকটি নৃত্য করিতেছে, হাত পা নাড়িতেছে, ওড়্না দুলাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহারও মুখের নিকট গিয়া তাল দিতেছে। ইহাদের মধ্যে বাদ্যকরদ্বয়ও সেইরূপে নানা তালে বাজাইতেছে, দর্শকগণ একদৃষ্টিতে সেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া বাহবা দিতেছে। রাস্তাতেও লোকে লোকারণ্য হইতেছে, পাহারাওয়ালা সেই ভিড় ক্রমাগত হাঁকাইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি মাত্র লোকের কথা বলিলাম; কিন্তু পাঠক, আবার দেখুন, কাফিখানার ভিতর প্রবেশ করিতেই বামে ও দক্ষিণে দুইটি অলকা-তিলকা মূর্তি পানের দোকান সাজাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে দুই দুইখানা বড় বড় আয়না। তাহার ভিতর পানের দোকানের সহিত শাড়ি, ওড়্না ও গহনামণ্ডিত মনোহারিণী মুসলমানী-মূর্তির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তাহাদের চক্ষু নড়িতেছে, মাথা হেলিতেছে, কানফুল ঈষৎ দুলিতেছে।

পাঠকগণের ভিতর যদি কোন মুসলমান থাকেন, তাহা হইলে লেখকের অনুরোধ, তিনি যেন এ সুযোগ পরিত্যাগ না করেন। এরূপ পান আর পাইবেন না, এ পানের প্রথমে দাম লাগে না। নগদ পয়সায় এ পান খরিদ করিতে হয় না, দেনায় পাওয়া যায়। কিন্তু সময়ক্রমে সেই দেনা সুদ সমেত (তোবা তোবা— মুসলমানের পক্ষে সুদের কথা আমি ভুলক্রমে বলিয়াছি) কমিশন সমেত শোধ করিতে হয়। সুতরাং এ সুযোগ পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

আর হিন্দু পাঠকগণ! আপনাদিগের ভাগ্য আর আমার ভাগ্য, উভয়েই সমান। মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও আমাদিগের হতভাগ্য সমাজের ভয়ে তাহা করিতে পারি কই? তবে লুকাইয়া চোরাইয়া যদি কেহ কিছু করিতে চাহেন, করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার মত মুখ-আল্‌গা লোকে ইহা জানিতে পারিলে সকলকেই বলিয়া দিবে।

ইহারা পানের দোকান করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু কই? কাহাকেও তো পান বেচিতে দেখিতেছি না; অথচ কাফিখানায় সকলকেই পান দিতে ত্রুটি করিতেছে না। তবে মধ্যে মধ্যে একজন উঠিয়া ইহাদিগের কাহারও সহিত কোথায় গমন করিতেছে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় প্রত্যাগমন করিতেছে। ইহারা যে কোথায় যাইতেছে, তাহা যদিও প্রথমে আমি জানিতে পারি নাই, কিন্তু পরে শুনিয়াছিলাম। তাহা বলিয়াই যে আমি সকল কথা পাঠকগণকে বলিব, তাহা নহে। যিনি যাহা বিবেচনা করেন, তিনি তাহা মনে মনে ভাবুন; আমি কিন্তু বলিব না। আর যদি একান্তই জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, এক দিবস ইহাদের কাহারও সহিত গমন করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসুন। তাহা হইলেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

আমি একটি কাফিখানার কতক অংশ বলিলাম, কিন্তু সেই স্থানে যতগুলি কাফিখানা আছে, তাহা একই প্রকারের, একই ধরনের।

আবদুলের সহিত আমিও মুসলমানবেশে কাফিখানায় গিয়া উপবেশন করিলাম। পানওয়ালী পান দিয়া গেল। আমি উহা হস্তে করিয়া লইলাম, কিন্তু সকলের অদৃশ্যে সেই পান আবদুলকে দিয়া আমার নিকট যে পান ছিল, তাহাই সেই স্থানে বসিয়া চিবাইতে লাগিলাম। কাফিখানার অধ্যক্ষ কাফি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। আবদুল উভয় অংশই পান করিল। এমন সময় কাছেম আলির পরিচিত একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল। সে আসিয়া আমাদিগের নিকটেই বসিল, তাহার সহিত নানা প্রকার গল্প আরম্ভ করিলাম। ক্রমে কথা-প্রসঙ্গে কাছেম আলির কথা আসিয়া পড়িল। তখন তাহার নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, উহার প্রকৃত নাম কাছেম আলি নহে, উহার নাম গোলাম আলি। কানপুরের প্রসিদ্ধ জুয়াচোর মহম্মদ আলির পুত্র। মহম্মদ আলি মেছুয়াবাজারের আর একটি কাফিখানায় আসিয়া প্রায় মাসাবধি ছিল, এখন পিতা-পুত্রে উভয়েই দেশে গমন করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া নাচওয়ালীকে কিছু বক্‌শিশ দিয়া কাফির দাম মিটাইয়া দিলাম, এবং 'কাল আসিব' পানওয়ালীকে এই কথা বলিয়া সেই স্থান হইতে আমরা উভয়ে বহির্গত হইলাম। পরে পরামর্শ করিয়া অনতিদূরস্থিত খন্‌চায়' গিয়া উপস্থিত হইলাম।

মেছুয়াবাজারে 'খন্‌চার' সংখ্যা যে কত, তাহার অনুমানই হয় না। 'খন্‌চা' যে কি পদার্থ, তাহা বোধ হয়, অনেক পাঠকই জানেন না। 'খন্‌চা' আর কিছুই নহে, উহা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চণ্ডুখানা মাত্র। ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই ঘরের ভিতর ঘর-যোড়া একটি অতিশয় ময়লা বিছানা। তাহার উপর কতকগুলি মনুষ্য শুইয়া রহিয়াছে। কিন্তু

সে শয়নের শৃঙ্খলা নাই, কাহারও পায়ের নিকট কাহারও মাথা, কাহারও পেটের নিকট কাহারও মাথা, কাহারও মাথার নিকট কাহারও উরুদেশ ইত্যাদি। ইহার ভিতর স্ত্রীলোক আছে, মুসলমান আছে, হিন্দু আছে, বৃদ্ধ আছে, যুবক আছে, বালক আছে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, হিন্দু মুসলমান জ্ঞান নাই। প্রত্যেকেরই মুখের সহিত একটি পিত্তলের নল, একটি একটি প্রজ্বলিত ও কাচপাত্রে আবৃত প্রদীপের সহিত সংলগ্ন। সকলেই চোখ বুজিয়া আছে, চোখ বুজিয়া বুজিয়া এক একজন এক একটি মজার গল্প বলিতেছেন।

উহার ভিতরস্থিত একটি লোককে লক্ষ্য করিয়া আবদুল কহিল, 'রহমান ভাই, কাছেম আলি কোথায় বলিতে পার?'

রহমান চক্ষু না খুলিয়া বলিল, 'সে এবার বড় মাল মারিয়া দেশে গিয়াছে। আমাকে এবার কিছুই দিয়া যায় নাই।'

আবদুল বলিল, 'আমাকেও ভাই ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। তাহার বাটীর ঠিকানা আমি জানি না, জানিলে সেই স্থানে যাইতাম। কেবল কানপুর, এইমাত্র জানি। কিন্তু কানপুরের কোথায় যে থাকে, তাহা আমি অবগত নহি।'

রহমান পুনরায় সেইরূপ ভাবেই কহিল, 'কানপুরের মহম্মদ আলির বাড়ি আর কে না জানে? বাজারের নিকটে তাহার বাড়ি। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিয়া দিবে।'

এই কথা শুনিয়া তাহাকে আর কিছু না বলিয়া উভয়েই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাছেম আলি ওরফে গোলাম আলির ঠিকানা পাইয়া আর সময় নষ্ট করিলাম না; কর্তৃপক্ষের আদেশ লইয়া সেই রাত্রিতেই রেলযোগে কানপুর-অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। নিয়মিত সময়ে কানপুর গিয়া পৌঁছিলাম। সেই স্থানের স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে বাজারের নিকট অনুসন্ধান করায় মহম্মদ আলির বাড়ি পাইলাম। তাহার ঘরে গিয়া দেখি, গোলাম আলি বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে তখনই ধরিলাম ও যে কারণে তাহাকে ধরা গেল, তাহার কারণ তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। সে শুনিয়া কিছুমাত্র ভয় করিল না, বরং একটু হাসিল। তাহার বাড়ি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম; ঘরের মেজে প্রভৃতি সমস্তই খুঁড়িয়া ফেলিলাম, কিন্তু কোন স্থানে চোরা দ্রব্যের কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে ঘরের দেওয়াল খুঁড়িতে খুঁড়িতে উহার ভিতর এক স্থান হইতে নসিরুদ্দিন ও গোলাম হোসেনের প্রায় সমস্ত অলঙ্কারই বাহির হইয়া পড়িল।

অনুসন্ধানে আরও জানিতে পারিলাম যে, কাছেম আলি, ওরফে গোলাম আলির পিতা-মাতা, স্ত্রী ও একটি পুত্র সেই স্থানে আছে; চুরি জুয়াচুরিই ইহাদিগের ব্যবসা। ইহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্যটন পূর্বক নানারূপ জুয়াচুরি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্বাহ ও পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এলাহাবাদের নিকটস্থিত পর্বতে ফকির থাকার সমস্ত কথাই মিথ্যা। কাছেম আলি মধ্যে মধ্যে ফকির-দর্শনের ভান করিয়া গোলাম হোসেনকে প্রতারণা পূর্বক কানপুরে গমন করিত ও যাহা কিছু লইয়া যাইত, তাহা বাড়িতে প্রদান করিয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিত।

মহম্মদ আলির অনুসন্ধান করিলাম। সে তখন সেই বাড়িতে ছিল না, কোথায় যে গমন করিয়াছে, তাহাও কেহ বলিল না। সুতরাং তাহাকে না পাইয়া কাছেম আলি ওরফে গোলাম আলিকে লইয়াই কলিকাতায় আগমন করিলাম। বৃদ্ধ, গোলাম হোসেন ও তাঁহার স্ত্রী এই সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ও অলঙ্কারগুলি দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পাড়ায় সমস্ত লোক একে একে সেই স্থানে আসিতে লাগিল। কাছেম আলির কার্যকলাপ শুনিয়া, তাহার এই ভয়ানক জুয়াচুরি ব্যাপার অবগত হইয়া, সকলেই তাহাকে সুমধুর বাক্যে সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বা তাহাকে প্রহার করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু পুলিস সেই স্থানে উপস্থিত ছিল বলিয়া তাহাদের সেই আশা কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইল না। গোলাম হোসেনের সেই পুত্রবধূ এত দিবস পর্যন্ত কাছেম আলিকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় দেখিয়া আসিতেছিল, যাহার সামান্য অসুখ হইলেও সে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিত; আজ সে যখন জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামী জুয়াচোর, তাহার সপত্নী ও সপত্নীপুত্র বর্তমান আছে, তখন সে যেন হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিল এবং সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। মোকদ্দমা আদালতে প্রেরিত হইল। এই মোকদ্দমা দেখিবার জন্য আদালতে লোকের স্থান হইল না। যে শুনিল, সেই 'যমালয়ের ফেরতা মানুষ' দেখিতে আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইতেছে, এমন সময় আদালতের বাহিরে একটা বৃক্ষের নিচে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই গোলযোগ দেখিবার নিমিত্ত সকলে আদালত হইতে বহির্গত হইয়া সেই দিকে ছুটিল। দেখিল, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর্তনাদ করিয়া রোদন করিতেছে। তাহার আর্তনাদে হাকিমের আসন টলিল। তিনি চাপরাসী পাঠাইয়া উহাকে আপন এজলাসে ডাকাইলেন ও তাহার আর্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা আসামীর প্রতি